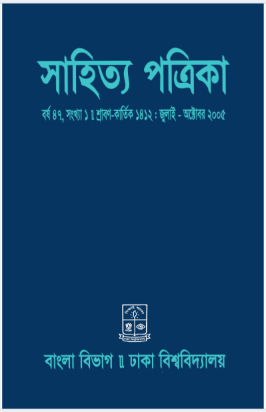

Vol. 47 | No. 1 | 2005

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে দাম্পত্য-সম্পর্ক

Volume	47
Issue	1
Year	2005
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	নূরুন্নাহার ফয়জের নেছা
Published online	October 1, 2005
DOI	10.62328/sp.v47i1.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v47i1.1
Pages	০৭-২৮
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে দাম্পত্য-সম্পর্ক

নূরুন্নাহার ফয়জের নেছা*

প্রথানুগামিতা নয় বরং প্রচলকে প্রজ্ঞা ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা মন্থন করে প্রাপ্ত সত্যকে সাহিত্যিক-জীবনের অন্বিষ্ট করার অনন্য অঙ্গীকার নিয়ে বিলম্বিত কল্লোল-যুগে বাংলা কথাসাহিত্যের অঙ্গনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের(১৯০৮-১৯৫৬) চমকপ্রদ আবির্ভাব। সকল বিষয়েই তাঁর ছিল নিজস্ব বিচার-বিশ্লেষণ, মত-অমত। তাঁর সাহিত্যে সমাজ, পরিবার, প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস, নারী-পুরুষের সম্পর্ক ইত্যাদি বিশ্লেষিত হয়েছে সমগ্রতাসন্ধানী, বাস্তবনিষ্ঠ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে। দাম্পত্য জীবনে সম্পর্কহীনতাই শুরু থেকে তাঁর উপন্যাসে প্রকট হয়ে উঠতে দেখা যায়। নিতাইবসুর মতে,

> ঘরোয়া দাম্পত্যজীবনের মিলিত মধুর রূপ মানিকের দৃষ্টিতে স্বতঃস্ফূর্ততা লাভ করত না। ...অন্তঃসারশূন্য দাম্পত্য-সম্পর্কের রূঢ় বিশ্লেষণেই মানিকের অনন্যতা। তিনি যে সাহিত্যজীবনের প্রথমাবধি দাম্পত্য প্রেমের মাধুর্যের পরিবর্তে তার অন্তর্নিহিত অন্তঃসারশূন্যতাকে তির্যক দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেছিলেন, তার স্পষ্ট প্রমাণ।[১]

দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া তাঁর প্রায় সকল গল্প-উপন্যাসেই প্রতীয়মান।

মানব সভ্যতায় নারী-পুরুষের মধ্যেকার বৈবাহিক সম্পর্ক বহুকাল থেকেই সকল দেশে, সকল জাতিতে স্বীকৃত ও প্রচলিত একটি ব্যবস্থা। আবার এই ব্যবস্থাটি নিয়ে ব্যক্তিগত কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক কিংবা গোষ্ঠীগত পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন মত ও বিশ্বাসেরও নিতান্ত অভাব নেই।

বিবাহের মধ্য দিয়েই নারী-পুরুষের মধ্যে স্থাপিত হয় দাম্পত্যসম্পর্ক। সাধারণভাবে বিবাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে, marriage হচ্ছে :

> a form of relationship between a woman and a man which is historically conditioned, sanctioned and regulated by society. It establishes their rights and obligations to each other and to their children. The

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

> nature of marital relationships to a great extent determines the growth of the population and the physical and spiritual condition of new generation. Marriage regulates and realizes natural need of people to continue their family, which is transformed by social conditions and culture. ... As a social relationship, marriage is primarily of a moral nature, since the man and woman enter into it as individuals. Among the moral values that are especially important for the stability of a marriage and individual sexual love, conjugal and parental duties, and mutual respect and aid.[২]

প্রখ্যাত নৃতাত্ত্বিকদের দৃষ্টিতে বিবাহ একটি অপরিবর্তনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, যা মানবতার জন্য চিরন্তন। এডওয়ার্ড ওয়েস্টারমার্ক-এর মতে,

> Among the lowest savages, as well as the most civilized races of men, we find the family consisting of parents and children, and the father as its protector.[৩]

এই পরিবার ব্যবস্থাকে স্থায়িত্ব দিয়েছে বিবাহ, যা একটি নিয়মতান্ত্রিক দৈহিক সম্পর্কের সঙ্গে অর্থনৈতিক দায়বদ্ধতাকেও জুড়ে দিয়েছে। ওয়েস্টারমার্ক আরও বলেছেন,

> the institution of marriage … has developed out of a primeval habit. While variations in the details could be found in different human cultures, the fundamental marriage bond was unchanging[৪]

জর্জ মার্ডক-এর মতে,

> Marriage exists only when the economic and the sexual are united into one relationship, and this combination only occurs in marriage. Marriage, thus defined, is found in every known human society.[৫]

লুই হেনরি মর্গানের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, বিবাহপ্রথার বিবর্তন ঘটেছে তিনটি প্রধান ধাপে– প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুহাবাসী মানবের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে পরিবারের নিয়ন্ত্রণ ছিল মাতৃতান্ত্রিক, বিয়ে বলতে সেখানে ছিল গোষ্ঠীবিবাহ অর্থাৎ প্রত্যেক পুরুষের ওপর প্রত্যেক নারীর এবং প্রত্যেক নারীর ওপর প্রত্যেক পুরুষের অধিকার ছিল, সন্তানের ওপর সবারই অধিকার ছিল। বর্বর যুগে এক পুরুষ ও এক নারীর মধ্যে সীমিত পরিবার ও বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল এবং মাতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তখনও ছিল অশিথিল।

সবশেষে সভ্য মানুষের মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় গড়ে ওঠে একগামী বিবাহ ও পরিবারব্যবস্থা।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নারী-পুরুষের বিয়ে ও দাম্পত্যসম্পর্ক মূল্যায়িত হয়েছে নিম্নরূপে,

> In the Jewish tradition marriage is looked upon as a divine covenant. ... Roman Catholic teaching stressed the sacred character of marriage. ... Most Protestant denominations regard marriage as a sacramental rite or as having a "sacramental character."... The (Islamic) wedding ceremony, performed before a mullah or priest, required two witnesses. ... Buddhist clergy usually are present at marriage ceremonies, exhorting the couple to lead examplary lives, to follow the teachings of the Buddha, and to set a proper example to any children born of the marriage. ... (Hindu) marriage is mandated as a religious duty and is not a matter of choice.[৬]

দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক ধর্মেই নারী-পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। কার্ল মার্কস মনে করতেন,

> the family structure was inherently exploitive, with capitalists treating their wives and children as property and bequeathing their accumulated assets to their children. Children should be raised by the state, marriage and inheritance should be eliminated, and noncommittal sex should be the only from of relationship.[৭]

বার্নার্ড শ' সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় বিয়ে ও দাম্পত্যসম্পর্কের স্বরূপ বিষয়ে বলেছেন,

> If a married couple cannot agree, they can obtain a divorce without having to pretend to disgrace themselves as in Protestant England. ... the Soviet does not tolerate illicit relations. If a man lives with a woman as husband and wife he must marry her, even he has to divorce another wife to do it. The woman has the right to the status of a wife, and must claim it.[৮]

অর্থাৎ নারী-পুরুষের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের স্বীকৃতি সেখানে নেই, প্রয়োজনে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নারী কিংবা পুরুষ তার কাঙ্ক্ষিত নারী কিংবা পুরুষের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। বার্ট্রান্ড রাসেলের মতে,

> সভ্য নর-নারীর পক্ষে বিবাহিত জীবনে সুখী হওয়া সম্ভব। তবে এর জন্য আগে কতকগুলি শর্ত পূরণ করতে হবে। উভয় পক্ষের লিঙ্গসাম্য মেনে চলার মতো মানসিকতা'থাকতে হবে। উভয়ের অধিকার সমান, এই বোধ থাকা জরুরি। (এক পক্ষের কাছে যদি কেবল টাকা মূল্যবান হয়, আর অপরপক্ষ মনে করে ভালো কাজ মূল্যবান, তাহলে ফল ভালো হয় না।) এই শর্তগুলো যদি পূরণ করা হয় তাহলে, আমি বিশ্বাস করি, বিবাহের কারণে দু' জনের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠবে তা হবে সর্বোৎকৃষ্ট এবং অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এই ব্যাপারটা অনুধাবন করা হয় নি এজন্য যে, এতো কাল স্বামী-স্ত্রী নিজেদের একে অপরের পুলিশম্যান গণ্য করে এসেছে। বিবাহ সম্ভাবনাপূর্ণ এবং সার্থক হতে হলে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়কেই উপলব্ধি করতে হবে যে আইনের কেতাবগুলিতে যা-ই লেখা থাক না কেন, পারিবারিক জীবনে তাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা ভোগ করা খুবই জরুরি।[৯]

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কমলাকান্ত বলেন,

> সুখে আমার অধিকার নাই, কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিও না যে, তোমরা বিবাহ করিয়াছ বলিয়া সুখী হইয়াছ। যদি পারিবারিক স্নেহের গুণে তোমাদের আত্মপ্রিয়তা লুপ্ত না হইয়া থাকে, যদি বিবাহনিবন্ধনে তোমাদের চিত্ত মার্জিত না হইয়া থাকে, যদি আত্মপরিবারকে ভালবাসিয়া, তাবৎ মনুষ্যজাতিকে ভালবাসিতে না শিখিয়া থাক, তবে মিথ্যা বিবাহ করিয়াছ ; কেবল ভূতের বোঝা বহিতেছ। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি বা পুত্রমুখ নিরীক্ষণের জন্য বিবাহ নহে। যদি বিবাহবন্ধে মনুষ্য-চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন না হইল, তবে বিবাহের প্রয়োজন নাই। ইন্দ্রিয়াদি অভ্যাসের বশ ; অভ্যাসে এ সকল একেবারে শান্ত থাকিতে পারে। বরং মনুষ্যজাতি ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া পৃথিবী হইতে লুপ্ত হউক, তথাপি যে বিবাহে প্রীতি শিক্ষা না হয়, সে বিবাহে প্রয়োজন নাই।[১০]

রবীন্দ্রনাথের বিবাহ বিষয়ক ভাবনার পরিচয় মেলে তাঁর 'হিন্দু বিবাহ' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে। এই প্রবন্ধে তিনি শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে হিন্দুবিবাহের নানা ফাঁকি ও স্ত্রীজাতির বঞ্চনা ও প্রকৃত সম্মান না পাওয়ার দিকটি আলোচনা করেছেন। স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্যবন্ধনের ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'প্রেমবিনিময়বশত স্বামীস্ত্রীর হৃদয়মনের সর্বাঙ্গীন ঐক্য ; এবং এরূপ ঐক্য যে দাম্পত্যবন্ধনের পবিত্র আদর্শ তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না।'[১১] এছাড়া বালবিবাহ, বহুবিবাহ ইত্যাদি সমস্যাগুলোর ক্ষতিকর দিকসমূহও উক্ত প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে। বিবাহ সামাজিক

একটি বিষয় বলে তিনি সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিবাহের নিয়ম কানুনের পরিবর্তন করার পক্ষে মত দিয়েছেন।

এসকল মত, মন্তব্য ও বিশ্বাসের বিভিন্নতা সত্ত্বেও একটি বিষয় মোটামুটি স্পষ্ট যে, নারী-পুরুষের দাম্পত্যসম্পর্ক প্রায় সকল সমাজেই স্বীকৃত। সাহিত্য সমাজবিচ্ছিন্ন কোন বিষয় নয়। তাই বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে উপন্যাসে নারী-পুরুষের এই সম্পর্ক শুরু থেকেই গুরুত্বসহকারে উপস্থাপিত হতে দেখা যায়। কিন্তু আশৈশব চিন্তায় ও আচরণে ব্যতিক্রমী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশপূর্ব বাংলাসাহিত্য দিয়েছিল শুধু এক দুর্মর অতৃপ্তির যন্ত্রণা। তাই বাংলাসাহিত্যে 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব চমকপ্রদ'[১২] হলেও সাহিত্য-সেবায়- তাঁর আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্তটি ছিল তাঁর সুচিন্তাপ্রসূত, দ্বিধামুক্ত ও আন্তর তাগিদজাত।

মানিকের উপন্যাসসমূহে রূপায়িত দাম্পত্যসম্পর্কের বিশ্লেষণের পূর্বে যে বিশেষ দেশ-কাল ও আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত তাঁর বিশিষ্ট মানসিকতা গঠনের জন্য দায়ী তার পরিচয় জানা আবশ্যক। কেননা 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো গোত্রছাড়া প্রতিভার যে উৎসকেন্দ্র, তার কারণ আমাদেরই অসম বিন্যাসের বিশৃঙ্খলা, তাঁর রচনায় যে টুকু অসুস্থতার ছায়া তা আমাদেরই রুগ্নতার প্রতিবিম্ব।'[১৩] 'তিরিশ চল্লিশের অস্থিরতার দশকে তিনি কলম হাতে নেমেছিলেন সামন্ত, আধাসামন্ততন্ত্রে ঘেরা ও ঔপনিবেশিক কলুষতায় ভরা জনজীবনের প্রকৃত চেহারাটা কেমন, সেটাই সঠিকভাবে দেখাতে।'[১৪] বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশকে এদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে সামূহিক হতাশা, ক্ষোভ ও নৈরাশ্য দেখা দেয় সাহিত্যেও তার অপ্রতিরোধ্য প্রতিফলন তরুণ-অতরুণ নির্বিশেষে সকলকে সচকিত করে তোলে। একদিকে দ্রুত বেড়ে ওঠা ইংরেজ-সৃষ্ট শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং প্রায় সেই অনুপাতেই বেকারত্ব, গ্রাম-বাংলার ধ্বংসপ্রাপ্ত কুটিরশিল্প-নির্ভর অশিক্ষিত বেকারের বিশাল অংশের শহরমুখী হওয়া, শিক্ষিত গোষ্ঠীর পল্লিবিমুখতা আবহমানকালের বাংলার আর্থ-সামাজিক কাঠামাকে ভাঙনের শেষ সীমায় পৌঁছে দেয়। প্রথম মহাযুদ্ধকালীন রসদ ও কর যোগাতে গিয়ে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা হয়ে পড়ে অবনতিশীল। অথচ শাসক ইংরেজ-সরকার পুরস্কারের পরিবর্তে প্রবর্তন করল ১৯১৯ সালের মন্টেগু চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার আইন, রাউলাট আইন। ফলত জনমনে দেখা দিল অসন্তোষ, বিক্ষোভ। ১৯২০ সালের প্রথম ছয় মাস ধর্মঘটের পর ধর্মঘট, অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন অবশেষে গান্ধীজীর ১৯২১ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে 'স্বরাজ' লাভের ঘোষণায় তা ব্যাপক আন্দোলনের রূপ নেয়। কিন্তু সবাইকে হতাশ ও বিক্ষুব্ধ করে গান্ধীজী এই বিপ্লবের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। তারপরই দেশবাসীর ওপর নেমে আসে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ-সরকারের অত্যাচার-নির্যাতনের রুদ্র আক্রোশ।

তবে জাতীয় আন্দোলনের সর্বব্যাপী এই ব্যর্থতা শ্রমিকদের মধ্যে ততটা নৈরাশ্য সৃষ্টি করতে পারে নি। ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ওপর

ইংরেজ-সরকারের সতর্ক পর্যবেক্ষণ ও ষড়যন্ত্র-দমন-নিপীড়ন বাংলাদেশে কৃষক শ্রমিকের রাজনৈতিক শক্তিরূপে অর্বিভাবকে প্রতিরোধ করতে পারে নি। বরং রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নতুন সাম্যবাদী আদর্শে উদ্দীপিত হয়ে ১৯২৬ সালে বাংলাদেশে প্রথম কৃষক মজদুর পার্টি গঠিত হয়।

এই যুগ পটভূমিকায় দীনেশরঞ্জন দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'কল্লোল' (১৩৩০)। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে লেখকগোষ্ঠী জড়ো হয় তাঁদের লেখায় প্রধান দুটি সুর ছিল — এক. প্রবল বিরুদ্ধবাদ ও দুই. রোমান্টিক ভাববিলাস।

> তার উপর এসে দেখা দিল প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কন্টিনেন্টাল সাহিত্য। মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত জীবনে নতুন কোন আশার আলো এ যুগের লেখকেরা দেখতে পেলেন না। তাঁদের দৃষ্টি পড়ল শ্রমিক কৃষকের জীবনের প্রতি। কিন্তু তাদের সংগ্রামী জীবনের পরিবর্তে তাদের বস্তি-জীবনের বেআব্রু যৌন জীবনের প্রতিই দৃষ্টি গেল বেশী। ... ব্যর্থ জাতীয় আন্দোলনের নৈরাশ্যের মধ্যে দেখা দিল বাঙালী যুবকদের সন্ত্রাসবাদ। ... সেজন্য এই যুগের অনেক লেখকের মধ্যেই আছে রাজনীতি চিন্তার প্রতিফলন। কিন্তু কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের সম্বন্ধে তা সম্পূর্ণ প্রযোজ্য নয়। কারণ, তাঁরা তাঁদের পথের সম্বন্ধেই সচেতন ছিলেন না। তার মধ্যে ভাবালুতা এবং রোমান্টিসিজম যতটা ছিল সত্যভাষণের বলিষ্ঠতা এবং বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি ততটা ছিল না। সেখানে নৈরাশ্যবোধই প্রাধান্য লাভ করলো। সেজন্য এই রোমান্টিসিজম হল নিষ্ক্রিয় রোমান্টিসিজম। অর্থাৎ জীবনকে বর্ণময়রূপে প্রকাশ করে মানুষ যাতে সেই জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে, তারই চেষ্টা এবং পারিপার্শ্বিক বাস্তব থেকে তার মনকে বিচ্ছিন্ন করে নিষ্ফল অন্তঃসমীক্ষায় প্রবৃত্ত করবার প্রবণতা। ... এই আধুনিক পর্বেই বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব। কল্লোল, কালি-কলমের ব্যর্থতা সত্ত্বেও এ কথা স্বীকার্য, শরৎচন্দ্র-শৈলজানন্দের দৃষ্টি অনুসরণ করে বাঙালী লেখকের চোখ সমাজের নীচের স্তরের দিকে ফিরেছিল। ... মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই উত্তরাধিকারকেই আরো বলিষ্ঠরূপে নিয়ে এলেন বাংলা সাহিত্যে।[১৫]

মূলত 'গণমুখী বাস্তবধর্মী সাহিত্য কল্লোল-কালিকলমের যুগে অনেকেই লিখেছিলেন, যেগুলি 'রোমান্সের ওপিঠ ছাড়া আর কিছুই নয়। মানিকের গণজীবনের চিত্রায়ণ বৃহত্তর জীবনবোধে উজ্জ্বল।'[১৬] যদিও বুদ্ধদেব বসুর দাবি কল্লোলের 'সর্বশেষ, বিলম্বিত ও পরিপক্ব ফলের নামই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।'[১৭] কিংবা মানিক সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সেই বিখ্যাত উক্তি– 'আসলে সে 'কল্লোলেরই' কুলবর্ধন।'[১৮]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্য চর্চার আগের দিনগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন।

> স্কুল থেকে শুরু করে কলেজে প্রথম এক বছর কি দু-বছর পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র প্রভাবিত সাহিত্যই ঘেঁটেছি এবং তারপর কতদিন খুব সোরগোলের সঙ্গে বাংলায় যে 'আধুনিক' সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছিল তার সঙ্গে এবং সেই সাথে হ্যামসুনের 'হাঙ্গার' থেকে শুরু করে শ'-র নাটক পর্যন্ত বিদেশী সাহিত্য এবং ফ্রয়েড প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করেছি। ... ছোট-বড় লেখকের বই ও মাসিকের লেখা পড়তে পড়তে এই প্রশ্নটাই ক্রমে ক্রমে আরও স্পষ্ট জোরালো হয়ে উঠতে লাগল যে, সাহিত্যে বাস্তবতা আসে না কেন, সাধারণ মানুষ ঠাঁই পায় না কেন ? মানুষ হয় ভাল, নয় মন্দ হয়, ভাল-মন্দ মেশানো হয় না কেন ? ... ভদ্রজীবনের বিরোধ, ভণ্ডামি, হীনতা, স্বার্থপরতা, অবিচার, অনাচার, বিকার-গ্রস্ততা, সংস্কার-প্রিয়তা, যান্ত্রিকতা ইত্যাদি তুচ্ছ হয়ে এ মিথ্যা কেন প্রশ্রয় পায় যে, ভদ্রজীবন শুধু সুন্দর ও মহৎ ? ভদ্রসমাজের বিকার ও কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত চাষী-মজুর, মাঝি-মাল্লা, হাড়ি-বাগ্দীদের রুক্ষ কঠোর সংস্কারাচ্ছন্ন বিচিত্র জীবন কেন অবহেলিত হয়ে থাকে, কেন এই বিরাট মানবতা — যে একটা অকথ্য অনিয়মের প্রতীক হয়ে আছে মানুষের জগতে — সাহিত্যে স্থান পায় না ?[১৯]

কল্লোল ও কালি-কলমের ধারাকে মানিক গ্রহণ করেছিলেন এভাবে,

> বাংলা সাহিত্যে এই আধুনিকতা একটা বিপ্লবের তোড়জোড় বেঁধেই এসেছিল কিন্তু বিপ্লব হয় নি, হওয়া সম্ভবও ছিল না — সাহিত্যের চলতি সংস্কার ও প্রথার বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত তারুণ্যের বিক্ষোভ বিপ্লব এনে দিতে পারে না। জোরের সঙ্গে দাবি করা হয়েছিল যে, আমরা বস্তুপন্থী সাহিত্য সৃষ্টি করছি, কিন্তু প্রকৃত বস্তুবাদী আদর্শ কল্লোল, কালি-কলমীয় সাহিত্যিক অভিযানের পিছনে ছিল না। ... আশা করেছিলাম অনেক কিন্তু ক্রমে ক্রমে টের পেলাম, সাহিত্যে যে অভাব, যে অসম্পূর্ণতা আমাকে তীব্রভাবে পীড়ন করছে তার পূরণ হচ্ছে না। শৈলজানন্দের গ্রাম্য জীবন ও কয়লাখনির জীবনের ছবি হয়েছে অপরূপ — কিন্তু শুধু ছবিই হয়েছে। বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে এই বাস্তব সংঘাত আসেনি — বস্তির মানুষ ও পরিবেশকে আশ্রয় করে রূপ নিয়েছে মধ্যবিত্তেরই রোমান্টিক ভাবাবেগ। মধ্যবিত্ত জীবনের বাস্তবতা আসে নি, দেহ বড় হয়ে উঠলেও মধ্যবিত্তের অবাস্তব রোমান্টিক প্রেম বাতিল হয় নি, ওই একই রোমান্স শুধু দেহকে আশ্রয় করে খানিকটা অন্যভাবে রূপায়িত হয়েছে।
>
> শৈশব থেকে সারা বাংলার গ্রামে শহরে ঘুরে যে জীবন দেখেছি, নিজের জীবনের বিরোধ ও সংঘাতের কঠোর চাপে ভাবালুতার আবরণ ছিঁড়ে ছিঁড়ে

> জীবনের যে কঠোর নগ্ন বাস্তব রূপ দেখেছি — সাহিত্যে কি তা আসবে না ?
> এই বাস্তব জীবন যাদের — সেই সাধারণ বাস্তব মানুষ?[২০]

এই ভাবপ্রবণতার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ নিয়ে, সাহিত্যে জীবনের সমগ্রতা-সন্ধানের অঙ্গীকারকে সমুন্নত রেখে সমকালের নানা মতাদর্শাবলম্বী সাহিত্য-চর্চার চিহ্নিত কোন পথ অবলম্বন না করে মানিক বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র-স্বরের প্রবর্তন করেন। 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই বোধ হয় প্রথম বাঙালী সাহিত্যিক, আমাদের শিক্ষাগত নানাবিধ পূর্বসংস্কার এবং চিন্তাগত নানাবিধ ভাবালুতা সম্পর্কে যাঁর বিন্দুমাত্র মোহ চিল না।'[২১] তিনি তাঁর বিজ্ঞান-প্রীতি নিয়ে 'বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে সমকালীন সব সমস্যার, জীবনের নানা রহস্য, চরিত্রের নানা মেজাজকে লক্ষ করেছিলেন, বিশ্লেষণ করেছিলেন।'[২২] 'জীবন সম্পর্কে অন্বেষণ তাঁর বিজ্ঞানীর মত, অথচ সৌন্দর্য সম্বন্ধে একজন রোমান্টিক কবি-সুলভ সন্ধানী দৃষ্টিও তাঁর আছে। কেবল তফাৎ এই স্ব-কাল ও স্ব-প্রতিবেশে সেই সৌন্দর্যের সন্ধান না পেয়ে তিনি বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ।'[২৩]

মানিক তাঁর প্রথম উপন্যাস 'জননী'(১৯৩৫)-তে 'জীবনকে নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখে তাকে আবেগহীন চুলচেরা অথচ সম্ভাব্য বিশ্লেষণে'[২৪] দেখাতে চেয়েছেন।

> স্ত্রী হিসেবে শ্যামার ভাগ্য ঈর্ষণীয় নয়, দোজবরে স্বামী শীতল চোর, মাতাল, মিথ্যাবাদী, দায়িত্বজ্ঞানহীন। স্ত্রী বা প্রণয়িনীর ভূমিকায় শ্যামা অসার্থক। কিন্তু শ্যামা জীবনের সার্থকতা পেয়েছে জননীর ভূমিকায়। দায়িত্বজ্ঞানহীন স্বামীর সংস্পর্শে এসে তার প্রণয়ের ঘোর কেটে গিয়েছে। সুস্থ মধুর আস্বাদভরা দাম্পত্যজীবন সে কোন দিন ভোগ করে নি। সংসারের সমস্ত ঝামেলা আর ঝঞ্ঝাট শ্যামাকে একা বহন করতে হয়েছে। স্বামী শীতলের সঙ্গে তার গোড়া থেকেই ছাড়া-ছাড়া সম্পর্ক। শ্যামার প্রবল ব্যক্তিত্বের কাছে শীতল হটে গিয়েছে।[২৫]

সাত বছর নিষ্ফল দাম্পত্যজীবন কাটানোর পর তার জীবনে আসে প্রথম সন্তান এবং সংসারে জননীরূপে প্রতিষ্ঠা। অথচ

> নিচের তলার ভাড়াটে তরুণ দম্পতির উদ্দাম ছেলেমানুষি দেখে, বা বনগাঁয়ে বেড়ার ওপাশে রাজবালা ও তার স্বামীর মুখের চাপা হাসি আর দাম্পত্য আলাপ শুনে কখনো শ্যামার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে, কখনো সে শিউরে ওঠে। দাম্পত্য-সুখ বর্জিত এই নিঃসঙ্গ রমণী বুঝতে পারে সন্তানপালন ও সন্তানের ভবিষ্যৎ ভাবনা ভাবতে গিয়ে সে কোন চূড়ান্ত সম্পদ হারিয়েছে।[২৬]

তাই ভরা সংসারের মধ্যেও শ্যামা হয়ে যায় নিঃসঙ্গ।

'দিবারাত্রির কাব্য'(১৯৩৫) উপন্যাসে সুপ্রিয়া-অশোক, অনাথ-মালতী এবং হেরম্ব প্রত্যেকের দাম্পত্য-জীবন যেন এক একটি বিনষ্টির আলেখ্য। সুপ্রিয়া ভালবেসেছিল হেরম্বকে। হেরম্ব মনে করেছিল তা ছেলেমানুষী। তাই বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে বিয়ে

দিয়েছিল দারোগা অশোকের সঙ্গে। পাঁচ বছর অশোকের সংসার করেও নিজেকে সুপ্রিয়ার মনে হয়েছিল সেবাদাসী। স্বামীকে সে ভালোবাসতে পারে নি। বরং হেরম্বের প্রতিই তার ভালোবাসা ছিল অটুট এবং হেরম্বকে নিয়ে পালিয়ে সুখে শান্তিতে ঘর বাঁধার দুর্মর আকাঙ্ক্ষাও সে ব্যক্ত করে। অশোক ছাদ থেকে ফেলে সুপ্রিয়াকে হত্যা করতে চেয়েছিল। ভয়াবহ এই পরিণতির জন্য সুপ্রিয়া হেরম্বকেই দায়ী মনে করে। কেননা সুপ্রিয়ার অভিযোগ 'আপনি মেয়েমানুষের সর্বনাশ করেন কিন্তু তাদের ভার ঘাড়ে নেবার সময় হলেই যান এড়িয়ে।' (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ২৬০ : পরবর্তীতে মূল গ্রন্থ-পৃষ্ঠার সকল উল্লেখে এই-সূত্র ব্যবহৃত।) মালতী ষোল বছর বয়সে অনাথের হাত ধরে অনেক দূরে অচেনা-অজানা যায়গায় ঘর বাঁধে সুখী হবার আশায়। 'অথচ ছত্রিশ বছর বয়সের মালতীকে আজ অনাথ 'দেড়যুগ আঙুল দিয়ে ছোঁয় না।' (মা. র., প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০০) মালতী যখন তার জন্য উন্মুখ, অনাথ তখন তার প্রতি নির্মমভাবে উদাসীন।'[২৭] এক সঙ্গে বসবাস করার পরও তারা পরস্পরকে বুঝতে পারে নি। মালতী এই কষ্ট ভুলতে বরণ করে নিয়েছে আকণ্ঠ মদ্যপানের বিকৃত জীবনচর্যা ; ওদিকে স্ত্রীর সঙ্গে কথা পর্যন্ত বন্ধ করতে অনাথকে বেছে নিতে দেখা যায় দিনরাত্রি যোগাসনের আড়ালে স্বেচ্ছানির্বাসন। তাতেও তৃপ্তি না পেয়ে শেষ পর্যন্ত অনাথ রাতের অন্ধকারে স্ত্রী-কন্যাকে ত্যাগ করে পালিয়ে যায়। মালতীকেও শেষ পর্যন্ত পলায়নের পথ বেছে নিতে দেখা যায়। উপন্যাসের নায়ক হেরম্ব নিজের বিবাহিত স্ত্রীকে ভালোবাসতে পারে নি, স্ত্রীর প্রতি স্বীয় দায়িত্ব-কর্তব্যও পালন করতে পারে নি। গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার মাধ্যমে তার স্ত্রী নিরুপায় জীবনের অবসান ঘটায়। এই যে কতগুলো জীবন তাদের চাওয়া পাওয়ার অসঙ্গতি, ভয়, উৎকণ্ঠা, বিচ্ছিন্নতা, যন্ত্রণা, বিকার ইত্যাদি নিয়ে সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তেই আত্মবিনষ্টিকে বেছে নিল তার কারণ নিহিত আছে যুগের জঠরে। সমসাময়িক দেশকাল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে যে উপায়হীন, সম্ভাবনাহীন নৈরাশ্যের অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত করে তারই পরিণামে তারা হয়ে পড়ে আদর্শচ্যুত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট। ভষ্মীভূত মানবিক মূল্যবোধের পটভূমিতে স্বাভাবিক ভাবেই দেখা দিয়েছিল বিচ্ছিন্নতা, যৌন বিকৃতি, বিকারগ্রস্ততা, অস্তিত্বের সংকট প্রভৃতি। 'মানিক সেই যুগে মধ্যবিত্ত জীবনের যে বিকার লক্ষ করেছিলেন এই উপন্যাসের রূপক রচনার মধ্যে তাকেই বলিষ্ঠ ভাবে রূপায়িত করে তুলেছেন।'[২৮] একই সঙ্গে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের অভিনিবেশী পাঠক মানিকের লেখনীতে ব্যক্তি উপস্থিত হয় তার বহির্জগত ও অন্তর্জগত এই দুইয়ের সমন্বয়ে। ভেতরে বাইরে রিক্ত এসব মানুষ পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যেও এই শূন্যতা উপলব্ধি করে। তাই নীড়-প্রত্যাশী হয়েও তাদের নিরন্তর নীড়-সন্ধানীর যন্ত্রণা তাড়িত করে।

'পুতুল নাচের ইতিকথা'য়(১৯৩৬) কুসুম-পরান, যামিনীকবিরাজ-সেনদিদি, যাদবপণ্ডিত-পাগলদিদি, বিন্দু-নন্দলাল, কুমুদ-মতি প্রমুখের দাম্পত্য-সংকট 'দিবারাত্রির কাব্যে'র মতো আত্মঘাতী পরিণামমুখী না হলেও অনেকাংশেই সুস্থ ও

স্বাভাবিক নয়। কুসুম ও পরানের দাম্পত্য-জীবনের অন্তঃসারশূন্যতার পরিচয় উপন্যাসে দুর্লক্ষ্য নয়। বিশেষত বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও শশীর প্রতি কুসুমের অকপট আত্মনিবেদন, বিভিন্ন সময়ে শশীর সঙ্গে তার কথোপকথন — যেমন, 'পরানের বউ বলে যে ডাকলেন আজ ? পরানের বউ বললে আমার গোসা হয় ছোটবাবু।' (মা. র., প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৬) কিংবা 'এমন চাঁদনি রাতে আপনার সঙ্গে কোথাও চলে যেতে সাধ হয় ছোটবাবু। ... আপনার কাছে দাঁড়ালে আমার শরীর এমন করে কেন ছোটবাবু ?' (মা. র., প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০২) — এসবের মাধ্যমে স্বামী নয় বরং শশীর প্রতিই তার তীব্র আকর্ষণ ব্যক্ত হয়। 'স্বল্পবিত্ত, বেকার, দুর্বলদেহ পরাণ তেজী বৌ কুসুমকে তৃপ্ত করতে পারে না, অতৃপ্ত কুসুমের নিরুদ্ধ আবেগ প্রচ্ছন্নভাবে শশীকে কামনা করে কিন্তু তা প্রকাশ করার পথ খুঁজে পায় না বলে তার চলনে-বলনে চাঞ্চল্য, অস্থিরতা, খামখেয়ালিপনা।'[২৯] তাই কুসুমের বাবার কথায় 'সবচেয়ে ভালো বর দেখে' (মা. র., প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭০) বিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও আমরা দেখি সর্বদা প্রাণবন্ত এবং কিছুটা খেয়ালী স্বভাবের তেইশ বছরের বাঁজা মেয়ে কুসুম, যার স্বাস্থ্য কেবল বাইরের ফাঁকি নয় ভেতরেও মজবুত, তার দাম্পত্য জীবন ততটা মজবুত নয়। 'কুসুমের নারীজীবনের এই ট্র্যাজেডি বাংলা উপন্যাসে স্মরণীয়।'[৩০]

যামিনী কবিরাজ ও সেনদিদির অসম বিয়ে। যামিনী থুড়থুড়ে বুড়ো। শশীর বাবা গোপাল 'তুচ্ছ কতগুলি টাকার জন্য' 'প্রতিমার মতো কিশোরী' সেনদিদিকে বিয়ে দিয়েছিল 'বুড়া, পাগলাটে' যামিনীর সাথে। 'গাওদিয়া গ্রামে, কলিকাতা শহরে, দেশে বিদেশে কোথাও শশী যার মতো রূপসী দ্যাখে নাই, শুধু রূপের জন্যই হয়তো যে বদনাম কিনিয়াছে', (মা. র., প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৫) 'সেই সেনদিদিকে যামিনী কবিরাজ বিশ্বাস করে না, সন্দেহের তীব্র বিষে সে দগ্ধ হয়। এমন কি বসন্ত-আক্রান্ত মরণাপন্ন সেনদিদিকে শশী চিকিৎসা করুক এটাও সে চায় নি। শশীর কাছে মনে হয়, 'যে রূপের জন্য পৃথিবীর লোক উন্মাদ, স্ত্রীর যে সৌন্দর্য মানুষ তপস্যা করিয়া পায় না, যামিনী তাই পাইয়াছে। বুড়া বয়সে সে তো স্ত্রীর দাস হইয়া থাকিবে ! কী জন্য তাহার এই বিকৃত নিষ্ঠুর অবহেলা ?' (মা. র., প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৫) শশীর এই জিজ্ঞাসার জবাব নিহিত আছে অর্থগৃধ্নু, সম্ভোগবাদী সমাজে এবং ব্যক্তির অপার দুর্ভেদ্য রহস্যজটিল মনোলোকে, যেখানে লুকিয়ে আছে 'গোপন যৌন-ঈর্ষা।'[৩১]

যাদব পণ্ডিত ও পাগলদিদি দুজনেই বুড়োবুড়ি। যাদব 'ধার্মিক ও অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়াই' প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। 'গৃহস্থ যোগী তিনি, সংসারী সাধক। ... স্ত্রী ছাড়া সংসারে যাদবের কেহ নাই। পাগলাটে স্বভাবের জন্য গ্রামের ছেলে বুড়ো যাদবের স্ত্রীকে পাগলদিদি বলিয়া ডাকে।' আর 'মুখে একটাও দাঁত নাই, তোবড়ানো গাল, পাকা চুল, — পাগলদিদিকে যাদবের চেয়ে বুড়া দেখায়। পিঠটাও পাগলদিদির একটু বাঁকিয়া গিয়াছে। তবু, শীর্ণ জরাগ্রস্ত দেহে ক্ষীণ প্রাণটুকু লইয়া পাগলদিদি

ফোকলা মুখে অনবরত হাসেন, — এই ভাঙা বাড়ি, ডোবাজঙ্গল ভরা এই গাওদিয়া গ্রাম, এখানে তাহার বার্ধক্যপীড়িত জীবন, সব যেন কৌতুকময় — ঘনানো মৃত্যুর স্বাদে পাগলদিদি কৌতুকময়ী।' (মা. র., প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫০) পাগলদিদির মুখের কুঞ্চিত চামড়ার হাজার রেখার দিকে তাকিয়ে শশীর মনে হয় 'কালের অঙ্কিত চিহ্ন-সাংকেতিক ইতিহাস।' (মা. র., প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫১) পাগলদিদির গুছানো, পরিচ্ছন্ন ও শান্ত ঘরে শশীর সাময়িক ভালো লাগলেও 'এই ঘরখানার এতটুকু আকর্ষণ বাহিরে সে বোধ করে না।' (মা. র., প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫১) কারণ সেখানে প্রাণ নেই, 'মানুষের জ্বালা-করা বেদনার হল্লা' নেই। সামন্ত সমাজের কুসংস্কার ও অপবিশ্বাসের দিকটি এই দুই জরাগ্রস্ত বুড়োবুড়ির ঘরকন্না ও স্বেচ্ছামৃত্যুর মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে। 'অলৌকিক মহিমার জয়গান নয়, অলৌকিকতা ও অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসী একশ্রেণীর মানুষের মূঢ়তা, নির্মম সংকীর্ণতা লেখক তীক্ষ্ণ আঘাতে বিদ্ধ করেছেন।'[৩২]

বিন্দু-নন্দলালের বিয়ে প্রতারণা প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হলেও তাতে বিন্দুর সামান্যতম দোষ ছিল না। নন্দলাল সেই বিষয়ে পুরোপুরি অবগত হয়েও প্রতিশোধের বিষে জর্জরিত করে তোলে বিন্দুর জীবন। স্ত্রীর মর্যাদা না দিয়ে তাকে রক্ষিতার মত কেবল ফুর্তির উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেছে, বলপ্রয়োগ করে দিনের পর দিন মদ্যপানের মরণনেশায় আসক্ত করে অসুস্থ ও অস্বাভাবিক জীবনযাপনে বাধ্য করেছে। যে পাঁক থেকে পরে চেষ্টা করেও শশী তাকে উদ্ধার করতে পারে নি, এমন কি নন্দলালও পারে নি। বিন্দু সামন্ত সমাজের লোভ-শঠতা এবং ধনতান্ত্রিক সভ্যতার বিকৃতির শিকার।

মতি-কুমুদ তাদের বোহেমীয় জীবন নিয়ে উপন্যাসে এক ব্যতিক্রমী দম্পতি। গৃহবিমুখ যাযাবর স্বামীর সঙ্গে গ্রাম্য মেয়ে মতি সহজেই এলোমেলো পথেও জীবনকে বরণ করে নেয়। 'হয়তো একদিন ওদের প্রেম নীড়ের আশ্রয় খুঁজিবে, হয়তো একদিন ওদের শিশুর প্রয়োজনে নীড় না বাঁধিয়ে ওদের চলিবে না — জীবনযাপনের প্রচলিত নিয়ম-কানুন ওদের পক্ষেও অপরিহার্য হইয়া উঠিবে।' (মা. র., প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬২) এই সম্ভাবনার মধ্য দিয়ে মতি-কুমুদের কথা শেষ হয়।

> আর্টিস্ট বনবিহারীকে জয়া ভালোবেসেছিল, আত্মত্যাগের কল্পিত গৌরবে নিজেদের প্রেমকে মহান বলেই সে জানে ; কিন্তু গ্রাম্য মেয়ে মতি ও কুমুদের প্রেমে তার ঘুম ভাঙে ; ... জয়া মতির কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা পায়। তার প্রেমের ধারণাটিই ভুল, বনবিহারীকে নয়, প্রতিভাকে জয়া ভালোবেসেছিল আর সে প্রতিভাও বানিয়ে তোলা কল্পনায়। 'মিথ্যার মানসস্বর্গে' থেকে জয়ার নির্বাসন।[৩৩]

'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসটিতে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ এবং কিছু মানুষের হাতে পুতুল হবার বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদ রূপায়িত হয়েছে বলে মানিক দাবি করেছেন। বস্তুত সামন্তসমাজ ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশের ক্ষেত্রে বিরাট অন্তরায়। জীবন নির্বাচনে ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছা সেখানে মূল্যহীন, এমন কি সে বিষয়ে

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তির নিজেরই কোন উদ্বেগ কাজ করে না। কারণ সামন্ততন্ত্রে 'কারও স্বাতন্ত্র্য নাই, মৌলিকতা নাই, মনের তারগুলি এক সুরে বাঁধা। সুখদুঃখ এক, রসানুভূতি এক, ভয় ও কুসংস্কার এক, হীনতা ও উদারতার হিসাবে কেউ কারও চেয়ে এতটুকু ছোটো অথবা বড়ো নয়।' (মা. র., প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৮) এই সম্ভাবনাহীন নিষ্ফলা পুতুলের সমাজ ব্যক্তিকে কিছুই দিতে পারে না। কুসুম তাই বাঁজা, পাগলদিদি নিঃসন্তান, সেনদিদি বিতর্কিত পুত্র জন্ম দিয়ে মৃত্যুবরণ করে, বিন্দু তাই স্ত্রী কিংবা জননী কোনোটাই হতে পারে নি। সুখী, সুন্দর স্বপ্নের নীড় রচনা তাই সুদূর পরাহতই থেকে যায়।

'পদ্মানদীর মাঝি'(১৯৩৬) উপন্যাসে 'সাধারণ মানুষের আদিম ও অমার্জিত মানবতা, অশিক্ষিত ও কষ্টপীড়িত মানুষের চিরন্তন হৃদয়বেদনা ও গভীরতম প্রবৃত্তির অশান্ত সংঘাত, ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ জীবনপরিধির মধ্যেও অপরিচিত ও অনিশ্চিত পরদেশের অনিবার্য আকর্ষণ'[৩৪] নিখুঁতভাবে রূপায়িত হয়েছে। পদ্মাপাড়ের জেলেদের,

> ঘরে ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনদিন বন্ধ হয় না। ক্ষুধাতৃষ্ণার দেবতা, হাসিকান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতা, ইহাদের পূজা কোনদিন সাঙ্গ হয় না। এদিকে গ্রামের ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর ভদ্র-মানুষগুলি তাহাদের দূরে ঠেলিয়া রাখে। ওদিকে প্রকৃতির কালবৈশাখী তাহাদের ধ্বংস করিতে চায়, বর্ষার জল ঘরে ঢোকে, শীতের আঘাত হাড়ে গিয়া বাজে কন্‌কন্‌। আসে রোগ, আসে শোক। টিকিয়া থাকার নির্মম অনমনীয় প্রয়োজনে নিজেদের মধ্যে রেষারেষি কাড়াকাড়ি করিয়া তাহারা হয়রান হয়। জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর, নিরুৎসব, বিষণ্ন। জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সংকীর্ণতায়। আর দেশী মদে। তালের রস গাঁজিয়া যে মদ হয়, ক্ষুধার অন্ন পচিয়া যে মদ হয়। (মা. র., প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮)

জীবনের এই রূঢ় বাস্তবতায় দাম্পত্য-সম্পর্কেরও নেই কোন বিশেষ আবেদন। ক্ষুধার রাজ্যে জীবন সেখানে গদ্যময়। স্বামীদের চোখে স্ত্রী প্রয়োজনীয় উপকরণ। উপন্যাসের নায়ক কুবেরের সংসারে স্ত্রী মালা পঙ্গু। সে বিষয়ে তার যদিও বিশেষ কোন নালিশ নেই তবু মাঝে মাঝে স্ত্রীর প্রতি সন্দেহজনিত এক ধরনের বিতৃষ্ণা জাগে। কেননা ধীবর-সমাজে 'সমর্থ পুরুষদের রাত কাটে নৌকোয়-পদ্মার বুকে-ইলিশের সন্ধানে জাল ফেলে, অথবা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাত্রী পারাপার করে। ধীবর-মেয়েদের স্বভাব নিয়ে তাই একটু কানাকানি হয়।'[৩৫] বিশেষত মালার সদ্যপ্রসূত সন্তানের গৌরবর্ণ জেলেপাড়ায় সরস কৌতুকের জন্ম দেয়, যা কুবেরের মতো শান্ত নিরীহ গরীব জেলের মনেও সন্দেহ-বিষের জ্বালা ধরায়। পঙ্গু মালার বিচরণের জগত সীমাবদ্ধ। 'ঘরের কোনায় সে স্বতন্ত্র জীবনযাপন করে, জেলে পাড়ার রূঢ় বাস্তবতা তাই তাকে অনেকটা রেহাই দিয়াছে। ছেলেমেয়েগুলিকে ভালোবাসিবার মতো মনও তাহার আছে, সময়ও

সে পায়।' (মা. র., প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯) শরীর অপেক্ষাকৃত কম সচল বলেই যেন তার মন হয়েছে কল্পনাপ্রবণ। সে রূপকথা শোনায়। তার গল্প বলার অসাধারণ দক্ষতায় মন্ত্রমুগ্ধের মতো ছেলে-বুড়ো সকলেই মশগুল হয়ে যায়। 'আদিম অসভ্যতার আবেষ্টনী'র মধ্যে মালার 'সুমার্জিত সভ্যতার' এই অভিনয় কুবেরও 'বড়লোকের বাড়ির পোষা কুকুরের মতো উদাস চোখে' চেয়ে দেখে। কুবেরের এই আপাত নিস্তরঙ্গ ও শান্ত দাম্পত্য-জীবন হঠাৎ তরঙ্গ-চঞ্চল হয়ে ওঠে কপিলার আর্বিভাবে। হঠাৎই যেন সে তার অবচেতনায় অপরিচিত শূন্যতা (empty space) আবিষ্কার করে। 'মালা যে কোনদিন ওঠে নাই, হাঁটে নাই, ঘুরিয়া বেড়াইয়া চারিদিকে জীবনকে ছড়াইয়া মেলিয়া রাখিতে পারে নাই, তার জন্য কুবেরের কোনদিন আপশোস ছিল না। গতি নাই বলিয়া মালার আবদ্ধ ঘনীভূত জীবন তারই বুকে উথলিয়া উঠিয়াছে — ভাঙা চালার নীচে সংকীর্ণ শয্যায় পঙ্গু মালার তুলনা জগতে নাই। কিন্তু অন্ধকার রাত্রে তামাক পৌঁছাইয়া দিতে সে তো কোনদিন নদীতীরে ছুটিয়া আসিতে পারে না — বাঁশের কঞ্চির মতো অবাধ্য ভঙ্গিতে পারে না সোজা হইয়া দাঁড়াইতে !' (মা. র., প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪) 'মালার শারীরিক পঙ্গুতার মধ্যেই নিহিত ছিল কুবের-কপিলার অবৈধ ভালোবাসার বীজ'[৩৬]

'বেগুনি রঙের শাড়িখানি পরিয়া চুলে চপচপে তেল দিয়া শুধু লীলাখেলা করিতেই কপিলা পটু নয়, কুবেবের সেবাও সে করে, — জীবনে কুবের কখনও যে সেবার পরিচয় পায় নাই। সারারাত্রি পদ্মার বুকে কাটাইয়া আসিয়া এখন সে না চাহিতে পা ধোয়ার জল পায়, পান্তাভাতের কাঁসিটির জন্য হাঁকাহাকি করিতে হয় না, খাইয়া উঠিবামাত্র তামাক আসে, প্রস্তুত থাকে তাহার দীন মলিন শয্যা এবং ফাঁক পাইলেই কোনদিন গোঁফ ধরিয়া টান দিয়া, কোনদিন একটা চিমটি কাটিয়া, হাসি চাপিয়া চোখের পলকে উধাও হইয়া — ঘুম আসিবার আগেই কপিলা তাহাকে স্বপ্নও আনিয়া দেয়।' (মা. র., প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪) নতুন এই অভিজ্ঞতা কুবেরের গৃহের প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়ে দেয়। সমাজ ও জীবনের যে স্তরে কুবেরের অবস্থান সেখানে তার এই দাম্পত্য-বহির্ভূত প্রণয় কেমন যেন সহজ ছন্দে মিশে যায়। তাকে বিকার, বিকৃতি বা পদস্খলন বলে মনে হয় না। কপিলা ও কুবেরকে ঘিরে মালার ঈর্ষাও তেমনি সহজাত ও নারীসুলভ বলে মনে হয়। 'রহস্যময়ী কপিলার প্রতি অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণেই প্রধানত কুবের মাঝির গোষ্ঠীমানসতা থেকে ব্যক্তিমানসতার নিষ্ক্রমণ তথা মুক্তি ঘটে।'[৩৭]

কপিলা এবং শ্যামাদাসের বিবাহিত জীবনে জন্ম নেয়া মৃত সন্তানের মতোই তাদের দাম্পত্য-সম্পর্কও অত্যন্ত নিষ্প্রাণ। কপিলার স্বভাব-চঞ্চল প্রাণময় জীবনের সহজ ছন্দটি শ্যামাদাসের জীবনছন্দের সঙ্গে — যাকে দেখলে মনে হয় বিশ্বজগতে কাউকেই তোয়াক্কা করে না — সঙ্গে মিল খুঁজে পায় নি। কপিলা অভিমান করে বাবার

বাড়ি চলে গেলে স্ত্রীর মান ভাঙিয়ে ঘরে ফিরিয়ে আনার পরিবর্তে শ্যামাদাস আরেকটি নতুন বউ ঘরে নিয়ে আসে, আবার দ্বিতীয় স্ত্রীর মৃত্যুর পরে অত্যন্ত সহজ অধিকারে নিঃসংকোচে কপিলাকে পুনর্বার ঘরে তুলে নেয়।

নীড় রচনা এখানেও হয় না। দারিদ্র্য, প্রকৃতি, সমাজপতি এই অসহায় অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষগুলোর চতুর্দিকে যে দুর্লঙ্ঘ্য দেয়াল তুলেছে তাতে হৃদয়ের জাগরণ সম্ভব হলেও হৃদয়ের চর্চা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

'জীবনের জটিলতা'(১৯৩৬) উপন্যাসে অধর-শান্তার দাম্পত্য জীবনকে ঘিরে মধ্যবিত্ত জীবনের প্রেমের জটিলতা, বিকার, বিকৃতি রূপায়িত হয়েছে। সেই সঙ্গে আছে মধ্যবিত্ত জীবনের বেকারত্ব, দারিদ্র্য, ভাববাদ ও বস্তুবাদের সংঘাত। শান্তা প্রতিবেশী বিমলের প্রতি অনুরক্ত টের পেয়ে অধরের অধিকারবোধ বিকারগ্রস্ত প্রেমিকের বিকৃত প্রেমচর্চায় রূপান্তরিত হয়। এতে শান্তার 'হাঁফ ধরিয়া গিয়াছে। দিবারাত্রি এভাবে মানুষ সাইকোলজির উপন্যাস রচনা করিতে পারে ? কিছুই সহজ নয়, সাধারণ নয়, প্রত্যেকটি কাজের গোপন অর্থ আছে, গোপন উদ্দেশ্য আছে।' নিজেকে শান্তার মনে হয় সার্কাসের পোষা জন্তু। এই অবিরাম অঢেল ভালোবাসাও শান্তাকে বিমল-বিমুখ করেতে না পারায় অধর নিজেকে প্রতারিত মনে করে এবং প্রতিঘাত ও প্রতিশোধের নেশায় সে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। স্ত্রীকে ছাদে নিয়ে গিয়ে তাকে আত্মহননের জন্য বাধ্য করে। কেননা অধর শান্তাকে ভালোবাসে, অথচ শান্তা তার বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তাকে ধ্বংস করে দিল। তাই আত্মহত্যাই শান্তার একমাত্র পরিণতি হওয়া উচিত বলে অধরের বিশ্বাস। তার যুক্তি 'আমি হলে মরতাম শান্তা, অসতী হওয়ার জন্য নয়, একজন নির্দোষ মানুষকে ঠকানোর জন্য আমি মরতাম।' (মা. র., প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪০) শান্তাও হঠাৎ বুঝতে পারে অধর বিমলের চেয়েও উগ্রভাবে, অন্ধভাবে তাকে ভালোবাসে। 'বিমলের মাথা খারাপ হয় নাই, কিন্তু অধর পাগল হইয়া গিয়াছে। এতদিন একসঙ্গে থাকিয়াও এই সর্বনাশা ভালোবাসার খবর সে পায় নাই।' (মা. র., প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪১) তাই অধরের সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত অপবাদ ও দণ্ড সে মেনে নেয়। বস্তুত অধরের কাছ সে 'পুতুল হইয়াছিল বইকী। পুতুল নিয়া অমন উন্মত্ত প্রেমিকের চলে না। অথচ ফেলিয়া দেওয়ারও উপায় নাই। তাকে অধর ত্যাগ করিতে পারিত না, মামার কাছে পাঠাইয়া দিলে চলিত না। যে পুতুল সাড়া দেয় না, তাকে নিজের হাতে ভাঙিয়া ফেলা ছাড়া অধরের আর কী উপায় ছিল ?' (মা. র., প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪২) মধ্যবিত্তের নানামুখী সঙ্কটের জটিল আবর্তে সুস্থ নীড় রচনা শেষ পর্যন্ত স্বপ্নলোকের হাতছানি থেকে যায়।

'দর্পণ'(১৯৪৫) মানিকের সদ্য গৃহীত রাজনৈতিক আদর্শের প্রভাবজাত। ১৯৪৪ সালের শেষের দিকে তিনি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। শুরু থেকেই মানিক মধ্যবিত্ত জীবনের কৃত্রিমতা, ন্যাকামি, ভণ্ডামির প্রতি বিরূপ এবং চাষী মজুরের জীবনের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। ভাবাবেগের প্রতি স্বভাব-বিদ্বেষ এবং

বৈজ্ঞানিকসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি অঙ্গীকার করেই তিনি সাহিত্যে বাস্তবতাবাদকে আঁকড়ে ধরেন। সাম্যবাদে আস্থা স্থাপনের পর 'তাঁর বিদ্রোহী প্রতিভা রূপান্তরিত হোল বিপ্লবী প্রতিভায়। বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিলেন তিনি। মহাসম্ভাবনাময় আগামী বিপ্লবের সাহিত্য শিল্পে তিনি হলেন তার ধাত্রী। তিলে তিলে গড়ে তুলতে লাগলেন বিপ্লবের তিলোত্তমাকে। বড় কঠিন বড় দুর্জয় সে সাধনা। আমৃত্যু অক্লান্ত সংগ্রামে মানিক জীবনজয়ী সাধনায় রত ছিলেন।'[৩৮] নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন বিষয়বস্তু, নতুন জীবনের প্রতিফলনের এই 'দর্পণ'-এ দাম্পত্য-সম্পর্কেরও পরিবর্তিত প্রতিবিম্ব সুস্পষ্ট। রম্ভা-রামপাল ও মমতা-হীরেন এই দুই দম্পতির জীবন শ্রেণীবিভক্ত সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তর নির্দেশক।

ঝুমুরিয়া গ্রামের বদমেজাজি ও জেদি বীরেশ্বরের তেজী ও জবরদস্ত চেহারার মেয়ে রম্ভা শহরে এসে লোকনাথের কাঠের কারখানার শ্রমিক তেজী ও বীর্যবান পুরুষ রামপালকে দেখে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হয়। অচিরেই তারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। রামপাল রম্ভাকে নিয়ে বস্তিতে এসে ঘর বাঁধে। কিন্তু 'স্বামীর ঘর করতে এসেই রম্ভা টের পায়, সে এক নতুন জগতে এসে পড়েছে, ঝুমুরিয়ায় তার এতদিনের পরিচিত জগতের সঙ্গে যার মিল বড়ই কম।' (মা. র., প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪০৭) এক পর্যায়ে সে রামপালকে বলেছিল তাকে অন্যত্র নিয়ে যেতে। 'কিন্তু সামলে নেয়, সইয়ে নেয় রম্ভা, চারিদিকের সংকীর্ণ কুঁকড়ে যাওয়া বিকৃত জীবনের কুৎসিত কদর্যতাকেই একমাত্র চরম সত্য বলে মেনে না নিয়ে সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য খুঁজে বার করার চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগে যায়। তখন সে সাহস পায়, তার ধৈর্য আসে। বিরোধ ও বিতৃষ্ণা উবে যায়। কষ্ট থাকে, মনের মধ্যে প্রতিবাদেও নিরুপায় নালিশের কষ্ট, কিন্তু তাতে আর তীব্র জ্বালা থাকে না। গাঁয়ের জীবনে নোংরামি কম নেই। তবে সেখানে মানুষ ছড়িয়ে থাকে, ধীরে সুস্থে গড়িয়ে গড়িয়ে বাঁচে, জীবনের গ্লানি ও আবর্জনাও ছড়িয়ে থাকে তফাতে তফাতে। এখানে সংকীর্ণ স্থানে গাদাগাদি করে আছে উর্ধ্বশ্বাস স্বার্থপর নিষ্পিষ্ট মানুষ। এই স্তূপীকৃত পাপ ও বিকারের মধ্যে এসে পড়ায় প্রথমে রম্ভা দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল, ক্রমে ক্রমে সে ভাবটা তার কেটে যায়।' (মা. র., প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪১১) কিন্তু তার দাম্পত্যজীবনের সবচেয়ে কঠিন আঘাত আসে স্বামী রামপালের দিক থেকে। 'ঝুমুরিয়ার সূর্যকে পর্যন্ত একদিন রামপালের তুলনায় তুচ্ছ মনে হয়েছিল রম্ভার, ভেবেছিল সূর্য মুখে যে সব কথা বলত তার রামপাল সেই সব কথা কাজে পরিণত করবে। এখন সে টের পেয়েছে, ও সব চিন্তাই রামপালের নেই। কাঠগোলার ব্যাপারটাতে অবস্থার ফেরে জড়িয়ে গিয়ে দু দিনের জন্য তার একটু নেতৃত্ব করার ঝোঁক চেপেছিল মাত্র। দেশ ও দশের জন্য বড় কাজ করে গৌরব অর্জন করার তাগিদ সে অনুভব করে না। তার চেয়ে কাঠের শৌখিন জিনিস তৈরি করা আর কীর্তন গাওয়ার দিকে তার ঝোঁক বেশি।' (মা. র., প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪১৩) ক্রমেই তার বুকভরা ভালোবাসা বিরাগে পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে রম্ভা তার স্বামীর মধ্যে পিতা বীরেশ্বরের

বীরত্ব ও বল-বীর্য কামনা করেছিল। স্বপ্ন ও আশাভঙ্গ হবার ফলে তার দাম্পত্যজীবন নিরুত্তাপ হয়ে পড়লেও সে ধৈর্য হারায় না। কৃষ্ণেন্দুর পরামর্শে সে ধীরে ধীরে স্বামীকে দেশ গড়ার আদর্শ কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার উৎসাহে মেতে ওঠে। ঘটনার আবর্তে ঝুমুরিয়া গ্রামের জমিদারের জামাতা হেরম্বের সঙ্গে সংঘর্ষে বীরেশ্বরের মৃত্যু হলে গ্রামের প্রজা সাধারণের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ ও অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। হেরম্বের বিরুদ্ধে এই গণআন্দোলনে কৃষ্ণেন্দু যোগ দেয়। রম্ভা ও রামপালও আসে। আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে 'বন্দুকের গুলি খেয়ে হেরম্বের হাতের বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে রামপাল মরে গেল ;' (মা. র., প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫২৪) রম্ভা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে।

মমতা ও হীরেন 'দুই বিরোধী ভাবদ্বন্দ্বে'[৩৯] দোলায়িত। মমতার বাবা অধ্যাপক এবং নামকরা বৈজ্ঞানিক। মমতা দেশের কাজ করে। হীরেন ধনী লোকনাথের সন্তান। সে মমতাকে ভালোবাসে এবং বিয়ে করতে চায়। মমতাও হীরেনকে ভালোবাসে এবং সে চায় হীরেন যেন সব কিছু ছেড়ে কুলি মজুরদের তার মতো করে ভালোবাসে ও তাদের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করে। এই স্বপ্ন নিয়েই সে হীরেনের সঙ্গে ঘর বাঁধে। কিন্তু অচিরেই তার স্বপ্ন গেল ভেঙে। কেননা বড়লোকের ছেলে হীরেন 'ভাবাবেগে রাজনীতি করতে এসে শেষকালে বিশ্বাসঘাতকতা করে ছিটকে গেল। এরা সংগ্রামের পর্ব পর্যন্ত কেবল আন্দোলনের সাথে থাকতে পারে। কিন্তু ঝড় উঠলে তখন নিজেরাই বেসামাল হয়ে পড়ে। ভাবপ্রবণ উচ্চবিত্ত একটা দাম্পত্য জীবন বাস্তবতার সংস্পর্শে এসে একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে গেল।'[৪০]

রম্ভা ও মমতা দুজনেই ভালোবেসে স্বেচ্ছায় জীবনসঙ্গী নির্বাচন করার পরও তাদের চাওয়া-পাওয়ার সঙ্গতি ছিল না। কখনও সেখানে আদর্শিক দ্বন্দ্ব, কখনো বা প্রত্যাশার আধিক্য তাদের দাম্পত্যজীবনের অন্তরায় হয়েছে। মানিকের বস্তুনিষ্ঠ ও বাস্তবনিষ্ঠ দৃষ্টিতে শোষণজর্জর সমাজে সুখী ও শান্তির নীড় রচনা সম্ভব হয় না। কখনো বাহ্যিক কারণ, কখনো আভ্যন্তর কারণে নীড়গুলি বিনষ্টির গহ্বরে বিলীন হয়ে যায়।

'শহরবাসের ইতিকথা'(১৯৪৬) উপন্যাসে গ্রামের বিত্তবান যুবক মোহনের গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে বাস করাও শেষ পর্যন্ত 'শহরের জীবন-স্রোতে সে কুটার মতো ভাসিয়া চলিয়াছে, নোঙরের ব্যবস্থা করিতে স্মরণ ছিল না।' (মা. র., প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১০৬) — এই উপলব্ধির মধ্য দিয়ে শহর-জীবনের জটিলতার দিকটি বিশেষিত হয়েছে। এখানেও দেখা যায় মোহন-লাবণ্য, চিন্ময়-সন্ধ্যার অন্তঃসারশূন্য দাম্পত্য-জীবনের ভিন্ন রূপ। মোহন-লাবণ্যের সন্তানবিহীন দাম্পত্যজীবনে এক পর্যায়ে লাবণ্যের মধ্যে দেখা দিল দুর্বোধ্য বিকার। 'কলেজের ইংরাজি সাহিত্য পড়া বিদুষী ও সুন্দরী লাবণ্য শহরে এসে বরং আরো আধুনিক হয়ে গেছে। ঝর্ণা সম্পর্কে তার উক্তিতে পীতাম্বরের অভিশাপ বা তার টোটকা ওষুধে বিশ্বাসে তার মন যেন পিছন দিকের আকর্ষণ বোধ করেছে।'[৪১] ওদিকে সন্ধ্যা স্বাধীনচেতা নারী, সে ভালোবাসায় বিশ্বাস করে না এবং চিন্ময়কে সে স্পষ্ট করে বলেছিল টাকার জন্যই সে তাকে বিয়ে করছে।

বিয়ের পরেও সে যেখানে খুশি সেখানে থাকবে, ভালো না লাগলে একসঙ্গে থাকবে না, কিন্তু যতকাল বাঁচবে তাকে টাকা দিতে হবে। চিন্ময় সন্তান চাইলে সে রাজি হয় না এবং সন্তান এড়ানোর জন্য পাঁচ বছর পৃথক অবস্থানের সিদ্ধান্ত নেয়। পরে চিন্ময় টাকার পরিমাণ কমিয়ে দিলে সে চিন্ময়ের ঘরে ফিরে যায়। 'তিরিশের দশকে নাগরিক তরুণসমাজ রাসেলের বিবাহ ও দাম্পত্যজীবন সম্পর্কিত গ্রন্থ পাঠ করে যে নতুন মানসিকতা আয়ত্ত করেছিল, বাংলার মাটিতে সন্ধ্যা যেন তারই ফুল ফোটাতে চেষ্টা করেছে। আপাতদৃষ্টিতে সন্ধ্যাকে কিছুটা উদ্ভট ও খাপছাড়া মনে হলেও তিরিশের দশকের কল্লোলীয়দের সৃষ্ট নারীচরিত্রের প্রেক্ষিতে তার একটি বাস্তবতা আমরা সহজেই অনুভব করতে পারি।'[৪২]

'সোনার চেয়ে দামী'(১ম খণ্ড, ১৯৫১ ; ২য় খণ্ড, ১৯৫২) উপন্যাসে সাধনা ও রাখালের দাম্পত্য জীবনের সঙ্কট ও সমাধানের দুই পর্বব্যাপী বিবরণের মধ্য দিয়ে মানিকের জীবনদর্শনের একটি সামগ্রিক রূপ স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। 'ব্যক্তিগত কামনা-বাসনাকে জয় করে মানুষকে কীভাবে সংগ্রামী হয়ে উঠতে হবে, পরিবারের সংকীর্ণ পরিধির বাইরে গিয়ে সমাজের বিস্তীর্ণ প্রতিবেশ থেকে নিজের চেতনাকে পরিপুষ্ট করতে হবে — সে-সম্পর্কে আলোকপাত করতে চেয়েছেন, ... ।[৪৩] মধ্যবিত্ত জীবনের দারিদ্র্য, বেকারত্ব সাধনা ও রাখালের জীবনে যে তিক্ততা, দূরত্ব ও সঙ্কট সৃষ্টি করেছিল তা এক পর্যায়ে বিকারে পরিণত হল। সাধনার মধ্যে মধ্যবিত্তের স্বর্ণালঙ্কারপ্রীতি এবং তা না পাওয়ার দুঃখ মানসিকভাবে তাকে দীন করে তোলে। যারা সচ্ছল, ধনী তাদেরকেই তার সুখী মনে হত। কিন্তু অচিরেই সেসব দম্পতির কৃত্রিমতা ও ফাঁকি এবং দারিদ্র্যবরণ সাধনার মোহ-মুক্তি ঘটাল। সোনার হারের মোহ তার ঘুচে গেল। সে বুঝতে পারল সংসারের সুখ, ভালোবাসা সোনার চেয়ে দামী। জীবন সম্পর্কে এই নতুন অভিজ্ঞতা সাধনার দৃষ্টিভঙ্গি পালটে দিল। শুরু হল সাধনার নতুন জীবন-সাধনা। খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের সহজ জীবনযাত্রা সত্যিকারের সুখের মনে হল তার কাছে, কেননা সেখানে নেই মধ্যবিত্তের জীবনের নানামুখী জটিলতা, বিকার, বিভ্রান্তি। সাধনার এই নব জীবনোপলব্ধি তাকে গণমুখী করে তোলে। সে সভায় যায়, পাবলিক মিটিংয়ে বক্তৃতা করে। অল্পদিনেই সে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ওদিকে স্ত্রীকে খুশি করতে বেকার রাখাল সোনার হার চুরি করে ব্যবসা শুরু করে, কিছুটা উন্নতিও করে। কিন্তু রাখালের এই অনৈতিকতা সাধনা মেনে নিতে পারে নি এবং আরেক দফা তাদের দাম্পত্য-সঙ্কট দেখা দেয়। তবে সঙ্কটের কারণ ও প্রেক্ষাপট পূর্বের চেয়ে ভিন্ন ছিল। রাখাল স্ত্রীর কাছে মধ্যবিত্তসুলভ পতিভক্তি আশা করে। কিন্তু সাধনা ততদিনে জনগণের অংশ হয়ে গেছে। বঞ্চিত মানুষের অধিকারের প্রশ্নে সে স্বামীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতেও দ্বিধা করে না। রাখাল এসব কারণে স্ত্রীকে ভুল বোঝে, কিন্তু ব্যবসায়িক অংশীদারের প্রতারণার ফলে নিজের ভুল বুঝতে পেরে সাধনার কাছে প্রত্যাবর্তন করে। সাধনার প্রতি রাখালের উক্তিতে তার ইঙ্গিতই পাওয়া যায়, — 'আমাদের আগের জীবন আর

ফিরে আসবে না। বাস্তব জগৎ যতটা পালটেছে আর আমরা যে অবস্থা আর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে পার হয়ে এসেছি তাতে অনেক কিছু অবাস্তব অসম্ভব হয়ে গেছে — স্বামীভক্তি-টক্তি অনেক কিছু। ... বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছাড়া আমাদের মধ্যে আর কোনরকম সম্পর্ক সম্ভব নয়। এটাই হবে শ্রদ্ধা ভক্তি ও স্নেহ ভালোবাসার মূল কথা যে, তুমিও মানুষ আমিও মানুষ। আমরা এক দেহ এক প্রাণ, আমি খেলে তোমার পেট ভরে, এ সব ফাঁকি চলবে না।' (মা. র., প্রাগুক্ত, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৫৮) দেখা যাচ্ছে এই উপন্যাসে 'একদিক দিয়ে লেখক যেমন পজেটিভমূলক পরীক্ষা করছিলেন গণতান্ত্রিক চিন্তা সামাজিক পারিবারিক সম্পর্কের উন্নতি করে কি না, আর একদিক দিয়ে তিনি নেগেটিভমূলক পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। তিনি দেখছিলেন মানুষের সম্পর্কের মধ্যে যে জট তার আসল কারণ অর্থনৈতিক অসাম্য।'[৪৪] তবে এসকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াও এই উপন্যাসে রাসেলের 'Marriage and Morals' গ্রন্থের বিবাহ সম্পর্কিত বিশ্লেষণের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে রাখালের উক্তিতে দাম্পত্য জীবনের নারী-পুরুষের লিঙ্গসাম্য, সমান অধিকার, ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতি সম্মান, রুচিসাম্য সর্বোপরি শারীরিক ও মানসিকভাবে সম্পূর্ণ অন্তরঙ্গতা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব অরোপিত হয়েছে। রাখাল ও সাধনার সামনে এগিয়ে চলার তাগিদের মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে মধ্যবিত্ত জীবনের ভাবাবেগ, মোহ, বিকৃতি, কৃত্রিমতা, মূল্যবোধ, সম্পর্কের জটিলতা ইত্যাদি অতিক্রম করে বাস্তবতাকে গ্রহণ করে জীবনের সত্যিকার অর্থ সন্ধানের নবযাত্রা সূচিত হয়েছে। মানিক এই উপন্যাসে জীবনার্থ সন্ধানের ও দাম্পত্যসম্পর্কের যথার্থ স্বরূপ নির্মাণের একটি রূপরেখা তুলে ধরেছেন।

'শুভাশুভ'(১৯৫৪) উপন্যাসে 'অর্থনীতির পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে সামাজিক মূল্যবোধগুলির নির্মম বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন মানিক।'[৪৫] তাই এই উপন্যাসে দাম্পত্য-সম্পর্কও ভিন্নতর আবেদনে উপস্থিত। ভবানীর বিকারের শিকার হয়ে তার প্রথম স্ত্রী সরমা তিলে তিলে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। তার মৃত্যুর পর কুমারের প্রেমিকা নন্দিতা নিছক টাকার জন্য ভবানীকে বিয়ে করে। 'কিন্তু সে লেখিকা, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তার একটি স্বচ্ছ ধারণা আছে– তাই স্ত্রী হিসেবে সে ভবানীর বিশ্বস্ত ক্রীতদাসী হতে চায় নি।'[৪৬] নন্দিতা বিশ্বাস করে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কেবল শারীরিকও নয়, মানসিকও নয় — দুয়ের সমন্বয়। কিন্তু বিকারগ্রস্ত ভবানীর সঙ্গে সে সম্পর্ক স্থাপন করা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। তাই স্বামীকে পুনরায় বিয়ে করার সুযোগ দিয়েছে সে। তবে স্বামীর সঙ্গে সে সম্পর্ক ছিন্ন করে নি। সন্ধ্যা, নন্দিতা এদের জীবনদর্শন মূলত ইউরোপীয় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, বিশেষত রাসেলের বিবাহ সম্পর্কিত মতবাদ দ্বারা অনুপ্রাণিত একথা বললে অত্যুক্তি হবে না।

প্রথম উপন্যাস 'জননী' থেকে 'শুভাশুভ' পর্যন্ত যে কয়টি উপন্যাস আলোচিত হয়েছে সেখানে একটি বিষয় অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, কোন দম্পতিই সুখী কিংবা সফল হতে পারে নি। ছোটবেলা থেকেই আমরা জীবনের যে গল্প শুনে অভ্যস্ত

সেখানে সকল বিপদ-বাধা অতিক্রম করে 'তারপর সবাই সুখে শান্তিতে বসবাস করতে লাগল' এমনই একটি সুন্দর পরিণামের মিষ্টি স্বাদ পেয়ে থাকি। কিন্তু মানিকের উপন্যাসে আমরা দেখি নষ্টনীড়, তিক্ততায় ছেয়ে যাওয়া জীবন। তবে কি তাঁর কাছে দাম্পত্যসম্পর্কের কোনো তাৎপর্য নেই ? এর জবাবে বলা যায়, নারী-পুরুষের দাম্পত্যসম্পর্কের বিষয়ে মানিকের মধ্যে কোন ভাবালুতা কাজ করে নি। নারী-পুরুষের বিবাহিত জীবনে সন্তান জন্ম দেওয়া ও লালন করার যে যুগ যুগ ধরে চলে আসা প্রথা সেই দিকটিও মানিক তাঁর আশ্চর্য শিল্পনিষ্ঠার দ্বারা সংযত রেখেছেন। তাঁর উপন্যাসের অধিকাংশ দম্পতিই সন্তানহীন, নিষ্ফলা। এ প্রসঙ্গে বার্ট্রেন্ড রাসেলের মতামত স্মরণ করা যায়, 'বিবাহ সন্তানপ্রসূ হলে, আর উভয় পক্ষ যদি যুক্তিশীল এবং মার্জিত হন, তাহলে সে বৈবাহিক বন্ধন আমরণ স্থায়ী হওয়ার প্রত্যাশা করা চলে।'[৪৭] মানিক তাঁর বাস্তবনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কখনো সরে আসেন নি। প্রকৃতপক্ষে একটি সুখী সুন্দর ও শান্তির নীড় রচনার জন্য যে সকল শর্ত ব্যক্তির নিজের মধ্যে ও সমাজের মধ্যে থাকা আবশ্যক, যতক্ষণ তা পূর্ণ হচ্ছে না ততক্ষণ পর্যন্ত মানিকের মতো বিজ্ঞানমনস্ক লেখকের পক্ষে কোন অবাস্তব জীবনরূপায়ণ অচিন্ত্যনীয়। আধাসামন্ত ও ঔপনিবেশিক কলুষতায় ভরা সমাজে ব্যক্তিজীবন যখন ছিল শৃঙ্খলিত ও নিষ্পেষিত তখন আপন মনের অন্ধকার গলিতে ইতস্তত পথ হাতড়ে প্রতিনিয়ত মুক্তির পিপাসায় ক্ষতবিক্ষত হওয়াটাই যেন দুর্লঙ্ঘ্য পরিণতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাছাড়া সমাজে নারীর অধিকারের প্রতি নিদারুণ উদাসীনতা ও জীবন-জীবিকা-সঙ্গী নির্বাচনে স্বাধীনতার ততোধিক অভাব সফল দাম্পত্যসম্পর্ক স্থাপনের পথে একটি বড় অন্তরায়। অন্তত প্রথম দিককার উপন্যাসগুলোতে মানিক এরকম মানুষদেরই আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী হওয়ার পরে তিনি দেখিয়েছেন সকল সামাজিক অপবিশ্বাস, কুসংস্কার ও বৈষম্য অতিক্রম করে এবং স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সমান অধিকার মেনে নিয়ে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারলে সুস্থ-সুন্দর-শান্তি-সুখের নীড় রচনা সম্ভব। অর্থাৎ যখন বাইরে ও ভেতরে তথা সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে মুক্তি, সম্প্রীতি, সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে তখনই নারী-পুরুষের দাম্পত্যসম্পর্ক সুফল ও সফল হবে।

বাংলা সাহিত্যে দাম্পত্যসম্পর্কের বিচিত্র রূপ, বিচিত্র সঙ্কট উপন্যাসের প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই দেখা যায়। বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ'(১৮৭৩) উপন্যাসে সূর্যমুখী-নগেনের দাম্পত্য-জীবনে সঙ্কটের যে বীজ উপ্ত হয়েছিল পরবর্তীকালে তার জটিলতর রূপ দেখা যায় 'কৃষ্ণকান্তের উইল'(১৮৭৮) এবং মনস্তত্ত্বের গূঢ় ব্যঞ্জনায় সঙ্কটের অভিনব রূপের অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'(১৯০৩) -তে। সেখানে শেষ পর্যন্ত ঘরের ছেলেকে ঘরে ফিরিয়ে আনবার একটা প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়েছে। যেন যুগ যুগ ধরে গড়ে তোলা সমাজের ক্ষতিগ্রস্ত অংশটি মেরামত করতে পারার মধ্যেই সকল সার্থকতা। কিন্তু পরিবর্তিত দেশীয় ও বিশ্বপরিস্থিতি কল্লোল, কালি-কলম ও পরিচয়

যুগের কবি-সাহিত্যিকদের বিশ্বাস-স্বপ্ন ও মূল্যবোধের যে পরিবর্তন সাধন করে তাতে মানুষের চারিত্রিক বিশ্লেষণ, পারস্পরিক সম্পর্ক তথা জীবনের মূল্যায়ণ ও নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে রূপায়িত হতে থাকে। বিষ্ণু দে-র কবিতার পঙক্তিতে মধ্যবিত্তের প্রেম ও দাম্পত্য-সম্পর্কের হতাশা ফুটে ওঠে — চাঁদের আলোয় চাঁচর বালির চড়া।/ এখানে কখনো বাসর হয় না গড়া ? (ঘোড়সওয়ার : চোরাবালি)।

সে যুগের এ সকল হতাশা, ক্ষোভ, যন্ত্রণা মানিক শুরু থেকেই স্বতন্ত্র-সচেতনতায় তাঁর লেখনীতে তুলে ধরেছেন। 'বাংলা কথাসাহিত্যে বস্তুনিষ্ঠায় তিনি অদ্বিতীয়,'[৪৮] তাঁর কথাসাহিত্যে 'বহুভঙ্গিম জীবননাট্য রূপ পেয়েছিল নিরাবেগ লেখনীর আশ্রয়ে, অশ্রুসঞ্চারী বাচনিক কৌশলে নয়। বস্তুনিষ্ঠ হয়েও শরৎসাহিত্য যে পরিমাণ আপ্লুত করত এবং অদ্যাপিও করে তার কারণ আবেগচালিত লেখকের পাঠকচিত্তে আবেগসঞ্চারে উন্মুখতা। মানিক কোন অবস্থাতেই আবেগতাড়িত নন। সংযত কলাবিদ চরমমুহূর্তেও সত্যের আব্রু টেনে দেন দৃঢ়ভাবে।'[৪৯] বাস্তবতা ও জীবনের সমগ্রতার সন্ধানে সর্বদা দৃঢ় প্রত্যয়ী মানিকের সাহিত্য-পরিক্রমায় বিশ্বসাহিত্য, ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন, মার্কসবাদ ইত্যাদির প্রভাব ছিল সক্রিয়। পরাধীন দেশ, ধ্বংসপ্রায় অর্থনীতি, শ্রেণীবিভক্ত সমাজ, বহুমুখী শাসন ও শোষণে জর্জর জীবনের প্রেক্ষাপটে মানিকের মতো 'সত্যকার স্রষ্টা, সত্যকার সাহিত্যশিল্পী'[৫০]-র পক্ষে দাম্পত্যসম্পর্কের মধুর রূপের চিত্রণ প্রত্যাশিত নয়। বরং 'দাম্পত্যসম্পর্ক চিত্রণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নির্মোহ বললে কম বলা হয়, তিনি একেবারে নিষ্ঠুর।'[৫১] মানিক তাঁর ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব অধ্যয়নজাত অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে ব্যক্তির অন্তরের গহনতম দেশ থেকে তুলে এনেছেন ভালোয়-মন্দয় মেশানো সমগ্র মানুষটিকে। একই সঙ্গে যে সকল শর্ত বিরাজমান থাকলে একটি সমাজে মানুষ রচনা করতে পারে সুখী সুন্দর স্থায়ী দাম্পত্যজীবন নেই সমাজের অনুপস্থিতিও প্রকট হয়ে ধরা পড়েছে তাঁর উপন্যাসসমূহে। তাই তাঁর উপন্যাসে দাম্পত্য-সম্পর্কের অন্তঃসারশূন্যতা, ফাঁকি ইত্যাদিও উপস্থাপিত হয়েছে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে। জীবনের যাথার্থ্য সন্ধানের প্রক্রিয়াতে দাম্পত্য-সম্পর্কের স্বরূপ কী হওয়া উচিত সে বিষয়ে তাঁর বিশিষ্ট ভাবনাটিও তাঁর শেষ পর্যায়ের উপন্যাসে দুর্লক্ষ্য নয়।

তথ্যপঞ্জি :

১. নিতাই বসু, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজজিজ্ঞাসা*, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ১৬৪
২. *Great Soviet Encyclopedia*, vol. 3, London, 1973, p. 720
৩. Edward Westermarck, *The History of Human Marrige*, 5th ed., London, 1925, pp. 26-37, 69-72
৪. ঐ
৫. George Peter Murdock, *Social Structure*, NewYork, 1965(1949), p. 8
৬. *The Encyclopedia Americana,* International. Edn., vol. 18, U.S.A,

pp. 349-350
৭. Karl Marx and Friederich Engels, *The Communist Manifesto*, Tr. Samuel Moore, Introduction by A J M Taylor, Great Britain, 1967, pp. 100-101
৮. Bernard Shaw, *Socialism and Marriage*,
৯. বার্ট্রান্ড রাসেল, বিবাহ, *বিবাহ ও নৈতিকতা*, অনু. আরশাদ আজিজ, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৫৮
১০. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আমার মন, *কমলাকান্ত*, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ৫৮
১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হিন্দু বিবাহ, *রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড*, কলকাতা, ১৪০৯, পৃ. ৬৬০
১২. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *কালের প্রতিমা : বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর বছর : ১৯২৩-১৯৯৭*, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৮১
১৩. প্রেমেন্দ্র মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *মানিক বিচিত্রা*, সম্পা. বিশ্বনাথ দে, কলকাতা, ১৯৭১, পৃ. ১৭
১৪. স্বস্তি মণ্ডল, প্রতিবাদ প্রতিরোধের গল্প, *মানিক জিজ্ঞাসা*, সম্পা. তরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ৩৬
১৫. সরোজমোহন মিত্র, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ২২, ২৩
১৬. সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তরকালের গল্প : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯
১৭. বুদ্ধদেব বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পা. বিশ্বনাথ দে, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪
১৮. অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, *কল্লোল যুগ*, কলকাতা, ১৩৯৫, পৃ. ১৮৫
১৯. সাহিত্য করার আগে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *মানিক গ্রন্থাবলী*, ১২শ খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড-সংস্করণ, ২য় প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ৩৫৬-৩৫৭
২০. ঐ
২১. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সাহিত্যিকের জীবন, সাহিত্যিকের মৃত্যু, সম্পা. বিশ্বনাথ দে, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২
২২. সরোজমোহন মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪
২৩. প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত, বিশ্রী ফ্রেমে সুন্দর ছবি, ত্রিশ দশকের ছোটগল্প, সম্পা. তরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
২৪. নিতাই বসু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪
২৫. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮
২৬. অশ্রুকুমার শিকদার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : আদি উপন্যাস, *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস*, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ২১৩
২৭. ঐ, পৃ. ২০৯
২৮. সরোজমোহন মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭
২৯. অচ্যুত গোস্বামী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের বিষয়বস্তু, সম্পা. বিশ্বনাথ দে,

প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪
৩০. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬
৩১. অচ্যুত গোস্বামী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের বিষয়বস্তু, সম্পা. বিশ্বনাথ দে, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪
৩২. আহমদ রফিক, মানিক উপন্যাসে গ্রামীণ জীবনচিত্র, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, ভূঁইয়া ইকবাল (সম্পা.), ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ. ৬৭
৩৩. স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়, পুতুল নাচের ইতিকথায় রোমান্টিক পালা, সম্পা. তরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০
৩৪. পিয়েরে ফাঁলো, বিদেশীর শ্রদ্ধা নিবেদন, সম্পা. বিশ্বনাথ দে, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫
৩৫. আবু হেনা মোস্তফা কামাল, পদ্মানদীর দ্বিতীয় মাঝি, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, ভূঁইয়া ইকবাল (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
৩৬. অশ্রুকুমার শিকদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫
৩৭. অরুণকুমার ঘোষ, নদী, নারী ও দ্বীপ : পদ্মানদীর মাঝি, সম্পা. তরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫
৩৮. সরোজমোহন মিত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫
৩৯. ঐ, পৃ. ২৮৪
৪০. ঐ
৪১. শ্যামল সেনগুপ্ত, শহরবাসের ইতিকথা, সম্পা. তরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪
৪২. ঐ, পৃ. ২২৩
৪৩. নিতাই বসু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০
৪৪. অচ্যুত গোস্বামী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের বিষয়বস্তু, সম্পা. বিশ্বনাথ দে, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১
৪৫. নিতাই বসু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫
৪৬. ঐ
৪৭. বার্ট্রান্ড রাসেল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮
৪৮. বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : সাহিত্যভাবনা, সম্পা. তরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১
৪৯. ঐ
৫০. সজনীকান্ত দাস, সম্পা. বিশ্বনাথ দে, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
৫১. সুবীর রায়চৌধুরী, ধরাবাঁধা জীবনে আত্মহত্যার অধিকার : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প উপন্যাস, সম্পা. কায়েস আহমেদ, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়*, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৫৫